লোকদেবতা কেন্দ্রিক পালাগান ও পরিবেশন রীতি

রত্নমালা নস্কর

অখণ্ড চব্বিশ পরগনায় বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর পুজো প্রচলিত আছে। গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে অথবা ইহলৌকিক সুখ-সুবিধা প্রার্থনায় এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো হাজত দেন। তাঁদের ধারণা অন্তর দিয়ে ডাকলে দেবদেবীও ভক্তের ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁদের মনস্কামনা পূরণ করেন। ভক্তরা কাজ উদ্ধার হলে বিবি, পির, গাজির নামে পূজো হাজত দেন এবং সামর্থ্য থাকলে পুজো উপলক্ষে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পালাগানের আসর বসান। পালাগানে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, এছাড়া পালাকারদের অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়। পালাগায়কদের মুখ থেকে শোনা যায় তাঁরা গুরুর কাছ থেকে গানগুলি শেখেন। অর্থাৎ গুরু শিষ্য পরম্পরায় কাহিনিগুলি লোকসমাজে প্রচারিত হয়ে আছে। মূল ঘটনা বা কাহিনি গুরুপরম্পরায় পেলেও পালাগায়কদের নিজস্বতা গানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। কোন কোন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ গানের কাহিনিগুলি লিখে রাখেন যেগুলি পুঁথি, পাঁচালি, গান বা গীত, কেচ্ছাকাহিনি নামে পরিচিত।

চব্বিশ পরগনায় লোকদেবতা কেন্দ্রিক পালাগানকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — (১) পাঁচালি পালার ধারা, (২) কেচ্ছাকাহিনির ধারা।

পাঁচালি পালার ধারাটি মুখ্যত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবি অবলম্বনে রচিত এবং কেচ্ছাকাহিনির ধারাটি প্রধানত পির, গাজি, বিবি মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক হলেও উভয় প্রকার পালাগানই লোকসমাজে 'পালাগান', 'পাঁচাল গান' বা 'পিরুলি গান' বলে এবং এই গানের দলকে পালাগান, পাঁচাল গান বা পিরুলি গানের দল বলে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পালাগান করেন।

ড. দেবব্রত নস্কর তাঁর চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা গ্রন্থে 'চব্বিশ পরগণার পালাগানের বিষয় বিভাগ' অংশে (পৃষ্ঠা-২১) লৌকিক দেবদেবী নির্ভর যে সমস্ত পালাগান লোকসমাজে প্রচলিত আছে তাদের প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — (১) দেবীপালা, (২) দেবপালা, (৩) বিবিপালা, (৪) পির ও গাজি পালা।

দেবী পালাগুলি গড়ে উঠেছে মুখ্যত লৌকিক হিন্দু দেবীকে কেন্দ্র করে

যেমন — শীতলা (বিরাট রাজা, চন্দ্রকেতু, রাবণ রাজার পালা), মনসা, ষষ্ঠী (গুণবতীর পালা), চণ্ডী, লক্ষ্মী (লক্ষ্মীনারায়ণ, বিনন্দ রাখাল, বীরবাহু, গোকুলচাঁদ, বলাই দত্ত, ভাঁটুই ঠাকুরের পালা), দুর্গা, বিশালাক্ষী (সিদ্ধেশ্বরের গান, অনন্তদেবের গান), নারায়ণী, সন্তোষী-মা।

দেবপালাগুলি হল — পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায়, বেনাকি বা বেনাকি মদন, বসন্তরায় পালা (জাগাতি মদন, একব্বর কাজী, হৃষিকেশ সদাগর ও চন্দ্রভানু রাজার পালা)। চাষপালা অর্থাৎ চাষি মহাদেবের পালা, শনি ঠাকুর (সুমঙ্গল কথা ও শঙ্খপতি সদাগরের কথা)।

বিবি পালাগুলি হল — বনবিবি (বোনবিবি ও শাজঙ্গুলির জন্ম, নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের সাথে বোনবিবি ও শাজঙ্গুলির যুদ্ধ ও বন্ধুত্ব, দুখের কাহিনী), ওলাবিবি (বীরসিংহ রাজার পালা, ইছপবাদশা বা পুত্রদান পালা, সুলতানছবির পালা), আসানবিবি, সাতবিবি, নয়বিবি, আওরজবিবি, ফতেমাবিবি, ঝেটুনে বিবি, আজগই, দরবার বিবি প্রমুখ।

সাতবিবির মধ্যে পড়েন — ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, দরবারবিবি, আসানবিবি, মড়িবিবি, ঝড়িবিবি ও দুধবিবি। কেউবা সাত বিবির ভিন্ন নাম বলেন যেমন — ওলা, ঝোলা, কালা, টান, টংকার, বাত, বাতবলবিবি।

নয়বিবি হলেন — ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, জহরবিবি, কুদ্রুনেবিবি, দড়মড়িবিবি, আজগোবিবিবি, ওছোলবিবি, মড়িবিবি, আসানবিবি।

পির ও গাজি পালাগুলি হল — মানিকপির (কিনু ঘোষ, রঞ্জনাবিবি বা লালচাঁদ চুরি, মুরদ কাঙাল, সুরত বাদশা), বড়পির (সুরজ জামাল), সত্যপির, মাদারপির, পির গোরাচাঁদ, মোবারকগাজি, বড়খাঁগাজি, দেওয়ানগাজি, রক্তানগাজি, হজরত জাবের প্রমুখ।

এই অঞ্চলে বহু লৌকিক দেবদেবী থাকলেও সবাইকে নিয়ে পালাগান রচিত হয়নি। তবে পালাগায়কগণ ভাঙটা বা টনসা পদ্ধতিতে যে কোনো লোকদেবতাকে নিয়ে পালাগান গেয়ে 'আসর বজায়' রাখেন।

লোকদেবতা কেন্দ্রিক পালাগানের বিষয় নিয়ে যে সমস্ত পুঁথি, কেচ্ছাকাহিনি বা গান গড়ে উঠেছে সেগুলি নিম্নরূপ।[১]

গাজি, কালু ও চম্পাবতীর পুঁথি গুলি হল — মহম্মদ মুনশী সাহেব প্রণীত "চম্পাবতী কালু-গাজি", আব্দুর রহিম সাহেবের "গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি"।

বনবিবি, দক্ষিণরায়, নারায়ণীকে নিয়ে যে সমস্ত পুঁথি রয়েছে সেগুলি হল — আব্দুররহিম সাহেব প্রণীত "বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুঁথি", মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেবের "বোনবিবি জহুরানামা", বয়নউদ্দিন সাহেবের "বনবিবি জহুরানামা"।

পির গোরাচাঁদের পালাগুলি হল — মহম্মদ এবাদোল্লা প্রণীত 'পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী', খোদা নেওয়াজের 'মুনশী পীর গোরাচাঁদ', মহম্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন ঘোষের 'তরিকায়ে কাদেরিয়া ও পীর গোরাচাঁদের পুঁথি', মুনশী নেয়ামতুল্লাহের 'শহীদ হজরত গোরাচাঁদের পুঁথি'।

মানিক পীরের পালাগুলি হল —মুনশী মোহম্মদ পিজির উদ্দীনের "মানিক পীরের কেচ্ছা", ফকির মহম্মদের "মানিক পীরের গীত", নসর শহীদের "মানিক পীরের গান", জয়রদ্দীন সাহেবের "পীরের জহুরানামা", বয়নদ্দীনের "মানিক পীরের গান", খোদা নেওয়াজের "মানিক পীরের গান"।

কালু-গাজী-চম্পাবতী, গোরাচাঁদ বনবিবি সংক্রান্ত যে সমস্ত পির নাটক রয়েছে সেগুলি হল — হরমুজ আলির "গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু", সতীশচন্দ্র চৌধুরীর "বনবিবি' প্রভৃতি।

এছাড়া আরও কিছু বাংলার লোকদেবতা কেন্দ্রিক গ্রন্থতালিকা নিম্নে দেওয়া হল — আদমখোর আকানন্দ - বাকানন্দের পুঁথি - আবদুল লতিফ, রওশন বিবির পুঁথি - অজ্ঞাত, পির একদিল শাহ্ পাঁচালি - আশক মোহম্মদ, ফাতেমার সুরতনামা - কাজী বদিউদ্দীন, মোবারক গাজীর কেচ্ছা — ফকির মুহম্মদ, রায়মঙ্গল — কৃষ্ণরাম দাস, সত্যপিরের পুঁথি - ফয়জুল্লা, সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালি - ঘনরাম চক্রবর্তী, বড়খাঁগাজী - সৈয়দ হালুমিয়া প্রভৃতি।

পুঁথিগুলির কাহিনি যে গান যে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গাজি কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথিতে গীত, রাগিণী, তাল, দুয়া, ধুয়া এই সমস্ত প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে 'গীত রাগিণী তাল আদ্ধা' 'গীত তাল আদ্ধা' 'গীত তাল আড়া' 'গীত তাল ঠেকা'। 'গীত তাল আদ্ধা' কথা বেশি বার রয়েছে।

পুঁথিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা হলেও মঙ্গলকাব্যের ধারা বজায় রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতোই পুঁথির কবিদের শাস্ত্র, পুরাণ, পৌরাণিক কাব্যের উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এর প্রভাব রয়েছে। পুঁথিতে কবিগণ একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের রীতি, অন্যদিকে লোকদেবতা কেন্দ্রিক কাহিনি এই দুই ধারাকে একত্রে মিলিয়ে

দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রগুলি রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে সৃষ্ট হলেও কোনও চরিত্রকে কোনও বিশেষ চরিত্রের অনুরূপ তাঁরা করেননি। যখন যেভাবে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে সেভাবে পৌরাণিক চরিত্রগুলির সাথে তুলনা করেছেন। আবার পৌরাণিক কাহিনিগুলিও নিজের মতো করে সংযোজন করেছেন।

পালাগানের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য — লোকদেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত পালাগান প্রচলিত তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। দর্শক বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে পালাগায়কেরা দায়বদ্ধ থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে গান করেন। যেমন — (১) কাওয়ালি, (২) পাঁচালি, (৩) রয়ানি, (৪) গীতিনাট্য, (৫) যাত্রা।

এছাড়াও লোকায়ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনি বিভিন্ন রীতিতে পরিবেশন করেন। যেমন — ব্রতকথা উপলক্ষে পাঠ — লক্ষ্মী, চণ্ডী, ষষ্ঠী, সন্তোষীমা প্রমুখ।

ফকিরিগানে — মুসলমান ফকিরগণ দুয়ারে দুয়ারে হাতে চামর নিয়ে গান করে ফেরেন এবং চাল পয়সা ভিক্ষা করেন। গোয়ালে গিয়ে মানিকপিরের গান করেন। আবার আঙিনায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর গান করেন। গৃহি মানুষেরা ফকিরদের ঈশ্বর প্রেরিত দূত ভাবেন।

(১) কাওয়ালি — মুসলিম কাওয়ালগণ বিভিন্ন পিরপিরানির দরগায় বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলমানি কেচ্ছাকাহিনিগুলি কাওয়ালি ঢঙে গান করেন।[২] পির ভাণ্ডড় সুলতান, বাবানগাজী, ফতেমাবিবি, হজরত জাবের, মানিকপির, বড়পির সাহেব, মাদারপির, পির গোরাচাঁদ, দাতা মেহবুব শা, মোবারক গাজি, পির একদিলশা, বনবিবি প্রমুখের গান উল্লেখযোগ্য।

(২) পাঁচালিগান — পয়ার ও ত্রিপদী উভয় ছন্দের গানকে পাঁচালি বা পঞ্চালিকা বলা হয়। পাঁচালি গানকে পালাগানের আদি অবস্থা বলা যায়। পাঁচালি গানের রীতিতে একজন মূল মহড়া গায়ক বা মূল গায়েন থাকেন। মহড়া গায়ক আসর বন্দনা, সর্ব দেবদেবীর বন্দনা, গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রার্থনা, বাদ্যযন্ত্রাদির সম্মান প্রদর্শন বা নমস্কার, নায়েক পার্টির বন্দনা করে মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেন। আসর বন্দনার সময় মোমবাতি, ধূপ জ্বালিয়ে আসরের একধারে পির / গাজি / বিবি / দেবদেবীর নাম করে ঘট বসিয়ে কিংবা মূর্তি স্থাপন করে আসর প্রদক্ষিণ করেন।[৩] পালাগানের শেষে পালাগায়কেরা ঘট ভাসিয়ে দেন।

প্রতিভাবান গায়ক নিজে গান রচনা করে তাতে সুর আরোপ করে সঙ্গে সঙ্গেই আসরে গান করতে পারেন। বাকি যাঁরা থাকেন তাঁরা দোহারা। যাঁরা দোহার তাঁরাই আবার বাদক। বাদকেরা খোল, করতাল, তবলা ইত্যাদি যন্ত্র বাজান। প্রতিটি

দলে কমপক্ষে পাঁচজন শিল্পী থাকেন। পাঁচজন শিল্পির মধ্যে একজন মহড়া গায়ক অপর চারজন ঘোষা বা দোহার। মূল গায়ক একটি করে লাইন সুর করে গান করেন বাকি দোহারাগণ সেই সুরে সুর ধরে গান করেন। মহড়া গায়ক বিভিন্ন চরিত্রের হয়েও গান করেন। দোহারদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ একাধিক চরিত্রের অভিনয় করেন। তবে তা বসে বসেই গান বা কথোপকথনের মাধ্যমে।

পালাগায়কেরা একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে পালাগান শেখেন। প্রথমে হয়তো তাঁরা পাঁচালি দলে কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, কিংবা শুধু দোহারের কাজ করতেন, পরে তাঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হয়ে যান। তাঁদেরও অনেক শিষ্য সংখ্যা হতে থাকে।

পালাগান পরিবেশনের সময় পালাগায়ক ও দোহারদের মধ্যে গান, প্রাসঙ্গিক কথোপকথন চলে। তাঁদের কথোপকথন অনেকটা নাটকীয় ভাবে পরিবেশিত হয়। মহড়া গায়ক অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে গান করেন কারণ দর্শক মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে তাঁকে নাচতেও হয়। তাঁর দুই পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। দোহারেরা বসে গান ও কথার মাধ্যমে মহড়া গায়ককে সাহায্য করেন। তাঁদের কেউ কেউ বাদ্যযন্ত্রও বাজান। মূল গায়েনের অসীম ধৈর্য। দোহারেরা বা বাদকেরা গানের ফাঁকে ফাঁকে সময় সুযোগ মতো জলযোগের জন্য বিশ্রাম নেন, কিন্তু মূল গায়ক এ সব করার অবকাশ পান না। পুরো আসরের রাশ তাঁকেই ধরে থাকতে হয়।

পাঁচালি গান এবং কীর্তন গানের মধ্যে প্রভেদ হিসেবে দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষে' গ্রন্থে (পৃ. ১৬২) বলা হয়েছে — "পাঁচালিতে গায়ক অঙ্গ ভঙ্গি করতে পারত, কিন্তু কীর্তনে সে সুযোগ ছিল না। পাঁচালিতে পাত্র /পাত্রীর সাজসজ্জার মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করা হত।"

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাগায়ক দীপককুমার মণ্ডল পাঁচালি গানের নতুন এক পদ্ধতি চালু করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে কোনওরকম দোহার লাগে না। মূল গায়ক বা মহড়া গায়ক মহড়া গানের এককলি গেয়ে যান। দোহারের পরিবর্তে বাঁশিবাদক বাঁশি (ফ্লুট) ও কনসার্ট (গুলোনো আকৃতি বাঁশি) বাজিয়ে দোহারের কাজ করেন।[৪]

অনেক সময় পাত্রপাত্রীর চরিত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থাকে। নিম্নে পালগানের আসরে পালাগান পরিবেশনরত গায়কের গান ও কথা থেকে সংগৃহীত কিছু আঞ্চলিক শব্দের নমুনা প্রদত্ত হল। যেমন — নাতি মারবো, ছাবাল, মাইয়া, মাতা খাবো, হেগে, বিইয়েছে, নাইন, ঠ্যাং, মুদি সরকার, ঝাঁটার বাড়ি

মারব, চুলো, সাঁইগুষ্ঠি, মাতার কাটে, ধরমবাবা প্রভৃতি। চরিত্র অনুযায়ী মুখে গ্রামীণ গালিগালাজও শোনা যায়। দেবীর মাহাত্ম্য গাইতে গিয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক গালগপ্প, পুরাণের প্রসঙ্গ তাঁদের কথায় চলে আসে। গানের ভাষা আঞ্চলিক হওয়ার কখনও কখনও দুর্বোধ্য লাগে। আঞ্চলিক শব্দগুলি আধুনিক শহুরে মানুষের কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়। গানের মধ্যে কথোপকথনের সময় তাঁরা গল্প করার ঢঙে কথা বলেন। মহড়া-গায়ক সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না প্রভৃতি প্রাক্ষোভিক বিষয়গুলি বাস্তবসম্মত ভাবে পরিবেশন করেন।

পালাগানের আসরে কমিক চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা থাকে। খানিকটা তাঁর উপর নির্ভর করে দলের জনপ্রিয়তা। মহড়া-গায়ক গান গাইবার পাশাপাশি কথোপকথনের সময় কমিক চরিত্রের সাথে কৌতুক করেন। কৌতুক করতে গিয়ে তাঁরা অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় টেনে আনলেও শ্রোতারা এগুলি হৃষ্ট চিত্রে উপভোগ করেন। এই কারণে দলের নামডাকও হয়। এক একটি পালায় এক একরকম নাটকীয় ক্লাইমেক্স থাকে। পালাগানে একটানা গুরুগম্ভীর ভাব কাটানোর জন্য কমিকের প্রয়োজন হয়।

পালাগানের ভাঙটা পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলায় অনেক লোকদেবতা আছেন কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনও কোনও লোকদেবতাকে নিয়ে পালাগান গাওয়া হয়। যে সমস্ত লোকদেবতাকে নিয়ে পালাগান প্রচলিত নেই অনেক সময় নায়ক পার্টির পক্ষ থেকে অথবা দর্শকদের মধ্য থেকে অজ্ঞাত কোনো এক দেবতাকে নিয়ে পালাগান গাইতে অনুরোধ করা হয়। তখন পালাগায়ক 'ভাঙটা' পদ্ধতি অনুসরণে দর্শক বা নায়ক পার্টির মনোতুষ্টির জন্য অনুরোধের পালাগান করেন। ভাঙটা পদ্ধতিটি হল কোনও লোকদেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক জনপ্রিয় পালার কাহিনির স্থানে দর্শক, শ্রোতা বা নায়কপার্টির অনুরোধের লোকদেবদেবীর দোহাই দিয়ে গাওয়া গান। একটা পালা ভাঙিয়ে আরেকটি পালা গাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ভাঙটা। যেমন রক্তান গাজীর পালা ভাঙটা পদ্ধতিতে গাওয়া হয়। অনেক পালাগায়ক এই পদ্ধতিকে অন্যায় বলে মনে করেন।

পালাগানের আসরে গায়ক ও দর্শকের মধ্যে খুব কাছের সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় পালাগান চলাকালিন মূল গায়ক শ্রোতাদের মাথায় চামর দুলিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। একে প্যালাতোলা, ভিক্ষা, মাঙন বলে। কেউ বেশি টাকা দিলে তিনি গানের মধ্যেই উল্লেখ করেন যে অমুক (তাঁর নাম ধরে) এত

টাকা দিয়েছে মা তার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন এবং কত টাকা দিয়েছেন তার উল্লেখও করেন। এটি নায়ক পার্টির সাথে পালাগায়কদের চুক্তি বহির্ভূত উপার্জন বলা যায়। আবার সাধারণ মানুষের দেবতার উদ্দেশ্যে দান খয়রাতের অভ্যাস বজায় রাখার কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রোতা বা দর্শকেরা মহড়া-গায়ককে প্রণাম করেন তাঁর ভাবেন মহড়া গায়ক যে দেবদেবির গান করেন তাঁরই প্রতিনিধি বা সেই দেবতা। তিনি নিজেও ভক্তের মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্বাদ করেন। কমিক চরিত্রদের মুখে ঠিক এইসময় কৌতুক করে বলতে শোনা যায়, 'দে মা দে তোর রাজার ঘরে বে হবে', 'তোর ছেলের পিঠে ছেলে হবে' ইত্যাদি।

মূল গায়ক অনেক সময় আসর থেকে দুটি বাচ্চা তুলে একজনকে বেহুলা ও অপরজনকে লখিন্দর রূপে আসরে বসিয়ে গান করেন। আবার একটু রঙ্গ-রসিকতার জন্য আসর থেকে এমন একজনকে ডেকে নেন যে হনুমানের মতো লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে দর্শকদের আনন্দ দেয়।

পাঁচালি গানে বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে প্রধানত ব্যবহৃত হয় — হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল। এছাড়া রয়েছে — নাল, তানপুরা, আড়বাঁশি, ঢোলক, দোতারা, ক্যাসিও, ঝাঁঝ, কাড়ানাকাড়া, ফ্লুট ও কর্ণেট, সাইটড্রাম। বর্তমানে মাইক লাগিয়ে গান করা হয় আবার খালি গলায়ও গান করে থাকেন। বাদকদের মধ্যে এক-একজন একাধিক যন্ত্র বাজানোতে নিপুণ।

পাঁচালি গানে মহড়া গায়ক আসর বিশেষে সাজসজ্জা করেন। তাঁদের অনেকেই গান করার সময় মনসা / বিবিমা / গাজিবাবা ইত্যাদি পালা অনুযায়ী পোশাক পরে গান করেন। বিবিমা, শীতলা, বনবিবি পালায় মহিলা সাজেন। মনসার পালায় প্লাস্টিকের সাপ, মানিকপির-বিবিমা-শীতলা-বনবিবি পালায় হাতে চামর, শিবের পালা হলে হাতে ত্রিশূল থাকে। পাঁচালি গানের ধারায় লক্ষ্য করা যায় মহড়া গায়ক এবং দোহারেরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। সেই ধুতি-পাঞ্জাবি অতি সাধারণ, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বর্তমান কালে দোহারদের মধ্যে প্যান্ট শার্টও পরে থাকতে দেখা যায়। মহড়া গায়কের গলায় একটি উত্তরীয় থাকে পরে সেটি কোমরে বেঁধে নেন। নায়ক পার্টির পক্ষ থেকে গলায় একটি গাঁদাফুল কিংবা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। সেটি পালাগান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহড়া গায়কের গলাতেই পরা থাকে।

পালাগান সাধারণত কোনও মঞ্চে নয়, বাড়ির আঙ্গিনায়, খোলা মাঠে, ঠাকুরতলায় পরিবেশিত হয়। নিচু জায়গাতেই মাদুর, খলপা বা ত্রিপোল পেতে

গায়ক, দোহার, বাদক গান পরিবেশন করেন। শ্রোতারা তাঁদেরকে ঘিরে বসেন। কেউবা দূরে কোনও উঁচু স্থানে পা ঝুলিয়ে বা খড়, নারকেল পাতা, খলপার উপর বসে গান শোনেন। গায়ক খোলা আকাশের নিচেই গান করেন। তবে নায়ক পার্টির আর্থিক সামর্থ্য থাকলে উপরে ত্রিপোল দিয়ে ছেয়ে দেন। তবে চারপাশ খোলা থাকে।

সুজিতকুমার মণ্ডল সম্পাদিত 'বনবিবির পালা' গ্রন্থে 'একানি পালা'র (পৃষ্ঠা-৩৫) কথা বলেছেন। পাঁচালি গানের ধারার আরেক নাম 'একানি পালা' বলা যেতে পারে।[৫]

বর্তমানে পাঁচালি ধারায় তৈরি পালাগান মানুষ পছন্দ করছেন না। পরিবর্তে লোকনাট্যের আকারে পরিবেশিত পালাগানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাই পালাকারগণ সমস্ত পালাগান গীতিনাট্যের রূপ দিয়ে গাইতে চান।

৩) পালাগানের রয়ানী ধারা ঃ দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে যেসব পদ্ধতিতে গান গাওয়া হয় তার মধ্যে 'রয়ানী' অন্যতম। সাধারণত পূর্ববঙ্গের মহিলাগণ রয়াণী ধারায় মনসা পূজা উপলক্ষে পূজাস্থলে বসে বা দাঁড়িয়ে এই গান করেন। একসাথে অনেকগুলি মহিলা গোল হয়ে বসেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান বা মহড়া-গায়িকা থাকেন। তিনি ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল দেখে এক একটি পয়ার বা ত্রিপদী সুর করে বলেন অন্যজনে সেই গানের দোহার দেন। একেই বলে রয়ানী গান। ক্ষেত্র বিশেষে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পালাটি শেষ করা হয়। অথবা একাধিক দিন সময় নিয়ে গাওয়া হয়। যাঁরা গান করেন তাঁরা ছাড়াও অনেক শ্রোতা থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দোহারদের সাথে গলা মেলান। পূর্ববঙ্গের অনেক পরিবার প্রধানত উত্তর চব্বিশ পরগনায় বাস করেন। তাঁদের মধ্যে রয়ানী ধারায় মনসামঙ্গল, দুর্গার শঙ্খ পরিধান গাইতে শোনা যায়।

৪) গীতিনাট্য ঃ গীতিনাটক আসলে লোকনাট্য। গীতিনাটক বলতে বোঝায় গানের মাধ্যমে নাটক। পাঁচালি গানের ন্যায় গীতিনাট্যেও দর্শকদের মধ্যে থেকে চরিত্র তুলে নেওয়া হয়। পাঁচালি গানে যেমন একজন মূল-গায়ক বা মহড়া-গায়ক থাকে এখানে সেরকম নয়। এখানে প্রত্যেকটা চরিত্র আলাদা আলাদা ব্যক্তি হন এবং তাঁরা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরেন। দোহার বা বাদক থাকেন। কোনও চরিত্রের প্রয়োজন পড়লে দোহারদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই খুব গুরুত্বপুর্ণ। তবে এখানে এক বা একাধিক প্রধান চরিত্র থাকে যেমন মনসা পালায় মনসা, চাঁদ সদাগর, বেহুলা। গীতিনাট্যে ভক্তির ভাবটি বজায় থাকে। মনস্কামনা

পূরণ করতে কিংবা মানসিক থাকলে নায়ক পার্টি তাঁর গৃহ প্রাঙ্গণে লোকদেবদেবীর পূজার সাথে গীতিনাট্য বা পাঁচালি গানের আসর বসান।

৫) যাত্রা ঃ পাঁচালি থেকে যাত্রার উদ্ভব বলে মনে করা হয়।[৬] যাত্রা শব্দের অর্থ শোভাযাত্রা বা মিছিল। একসময় বিভিন্ন উৎসব ও পূজা উপলক্ষ্যে নানা বর্ণের পোশাক পরিধান করে নাচ-গান-অভিনয়ের মাধ্যমে পথে ফেরিতেই যাত্রা হত। পরে যাত্রার এই ধরন বদল হয়েছে। পথে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান-অভিনয়ের পরিবর্তে যাত্রার জন্য আসর তৈরি হয়, কিন্তু পূর্বের নামটির বদল হয় নি।[৭]

অধুনা লোকদেবতা কেন্দ্রিক যাত্রাগানের প্রচলন হয়েছে। এক্ষেত্রে যাত্রা বা নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লোকদেবতার কাহিনিকে সাজানো হয়। যেমন – দুখে যাত্রা, মনসাযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ভাসানযাত্রা, মোনাইযাত্রা। যাত্রার বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে সংলাপ, গীত, অভিনয় এবং অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন থাকে। এখানে একই ব্যক্তি একাধিক চরিত্রের অভিনয় করেন না। একটি ব্যক্তি একটি চরিত্রেরই অভিনয় করেন। যেমন— বনবিবির পালায় বনবিবি, দুখে, দুখের মা, ধোনা, মোনা, সকলেই আলাদা আলাদা ব্যক্তি। নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সংলাপধর্মী অভিনয় করেন। ক্ষেত্রবিশেষে গান কিংবা কমিক আসে। অভিনয় হয়ে গেলে তিনি আর সেই স্থানে থাকেন না, মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যান।

তবে প্রচলিত যাত্রাপালায় দোহার থাকে না। মাঙন বা প্যালাতোলা হয় না। মঞ্চের প্রয়োজন হয় তবে ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ আসরেই পরিবেশিত হয়। আসরে বাদকদের একধারে বসে থাকতে দেখা গেলেও তাঁদের অভিনয়ে কোনও ভূমিকা থাকে না। কাহিনি লিখতে টেক্সটকে অনুসরণ করা হয়। পাঁচালিগান কিংবা গীতিনাট্যের মতো দর্শক বা শ্রোতাদের সাথে চরিত্রদের সরাসরি সংযোগ থাকে না। পাঁচালিগান কিংবা গীতিনাট্যে যেমন ভক্তি, দেবদেবী-কেন্দ্রিক পূজা এবং তাঁদেরকে ঘিরে সংস্কার থাকে, যাত্রায় সেটি থাকে না। এখানে দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকটি বেশি করে দেখা হয়। লোকদেবদেবীর প্রতি ভক্তি না থাকলেও দূর দূর থেকে দর্শকরা যাত্রা দেখতে চলে আসেন। কিন্তু পাঁচালগিান শুনতে কিংবা গীতিনাট্য দেখতে সাধারণত স্থানীয় অনুরাগীকেই বেশি দেখা যায়।

যাত্রায় প্রত্যেকেই চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরেন। বনবিবি পালায় দুখে এবং দুখের মা সাধারণ পোশাক পরেন। বনবিবি আঠারো ভাটির অধিকারিণী, তিনি

সকলের মা, তাঁর পোশাক দেবীর মতো। মাঝির চরিত্রে লুঙ্গি ও আলখাল্লা পরে কোমরে গামছা বাঁধেন। এইরূপ চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরার চলন অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করা যায়।

পালাগায়কদের অনেকেই যাত্রা, কীর্তন, গোষ্ঠ, দেহতত্ত্বের গান করেন। তাঁদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছেন কাওরা, বাগদী, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রমুখ। অখণ্ড চব্বিশ পরগনায় বহু পালাগায়ক আছেন। তাঁরা হলেন — সুদিন মণ্ডল, অনিলকুমার হাজরা, দুলালকৃষ্ণ মণ্ডল, বাসুদেব মণ্ডল, রফিকুল ইসলাম, বনমালী মণ্ডল, শহীদুল ইসলাম, জাফরআলি মণ্ডল, সন্তোষ মণ্ডল, দীপককুমার মণ্ডল, পাঁচু হালদার, আব্দুল জব্বার গায়েন, শ্যামল সরদার, বাঁশীনাথ হালদার, নকুল মণ্ডল, গোষ্ঠ মণ্ডল, ফটিক মণ্ডল, প্রবোধকুমার ছাটুই, বসন্তকুমার গায়েন, মোঃ আব্দুল ফকির, রবিন মণ্ডল, শশধর মহিষ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই। এই সমস্ত পালাগায়কেরা প্রতিষ্ঠিত পালাগায়ক ছিলেন এখনও আছেন। এঁদের সংখ্যা যেমন নিতান্ত কম নয় তেমনি এঁদের শিষ্য সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা যেমন— শীতলা, মনসা, লক্ষ্মী, পঞ্চানন, সন্তোষী মায়ের পালা গান করেন তেমনি মানিকপীর, বনবিবি, বিবিমা, গাজি সাহেব, বড়পির সাহেবের পালা পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ ছিল না এখনও নেই।

স্বাভাবিক প্রশ্ন, গোষ্ঠ এবং গাজনকে পালাগান বলা যায় কিনা? এর উত্তরে বলা যায় গোষ্ঠ বা গাজন গানের ক্ষেত্র বিশেষে পরিবেশন রীতিতে সাদৃশ্য আছে। যেমন — গাজন গানে মহড়া-গায়ক নৃত্য-গীত পরিবেশক ও বাদক থাকে। সাধারণত আসরে দর্শক ও শ্রোতা পরিবেষ্টিত হয়ে দিনে বা রাতে পালাগানের ন্যায় গোষ্ঠগান পরিবেষ্টিত হয়। তথাপি পালাগান ও গাজন গানে মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। যে কারণে গাজন গানকে পালাগান বলা হয় না। নিম্নে বিষয়টি দেখানো হল —

পালাগান ঃ মহড়াগায়ক সাধারণত একজন। মূল গায়ক অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ পোশাকে গান করেন। মূল গায়ক ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রতীক সজ্জা করেন। দীর্ঘ কাহিনি গীত হয়, তার শুরু ও শেষ থাকে। পালাগান পূজা উপলক্ষ্যে সাধারণত একটি দল গান করেন। বছরে যে কোনও মাসে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে পালাগান গীত হয়। একাধিক চরিত্র সাজ সজ্জা করে আসরে কাহিনি পরিবেশন করেন এবং বাদকগণ দোহার ও

যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁদের সাহায্য করেন। পালাগানের আসর সাধারণত গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা থাকলেও মহিলা সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

গাজনগান ঃ মহড়া গায়ক দু-জন। মূল-গায়ক সাধারণ পোশাকে গান করেন না। মূল-গায়ক সাধারণত রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী অথবা সাধারণ নরনারীর প্রতীক সজ্জায় গান করেন। দেবদেবীর লীলা বা সাংসারিক জীবনের খণ্ড চিত্র গাজন গানে তুলে ধরা হয়। সাধারণত একাধিক দল আসরে গান করেন। কেবলমাত্র চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিব পূজা অথবা রাধাকৃষ্ণের পূজা উপলক্ষ্যে গীত হয়। মহড়া গায়ক দুইজন সাজসজ্জা করেন এবং যন্ত্রীগণ ঘটনা বিশেষে কিছু কথা সুর ও তালের সাহায্যে করেন। সাধারণী বা বারোয়ারী, শিব বা রাধাকৃষ্ণ থানে এই গান অনুষ্ঠিত হয়। নারী পুরুষ শ্রোতা হিসেবে থাকলেও গাজন গানে যুবকদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় একটি পালাগানের আসরের পরিচয় ঃ একটি পালাগানের আসরে একদিনের যে কোনও একটি পালা ৩-৪ ঘন্টার কিংবা অনেকগুলো পালা সংক্ষেপে ৪-৫ ঘন্টার হতে পারে। ধর্মঠাকুরের গান গাইতে অনেক ক্ষেত্রে ১-১২ দিন লাগে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরা গ্রামে দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহ প্রাঙ্গণে চৈত্র মাসে তেরো দিনে বিবিমায়ের পূজো হয়। সাতদিনে আটটি পালা গাওয়া হয়। যেমন — দরবার বিবি, বনবিবি, বিবিমা, শীতলা, মানিকপির (কিনু ঘোষের পালা), গাজি সাহেবের পালা, স্বরূপ চাঁদের পালা। প্রথম দিন গান, হাজত দুটোই হয়। এরপর একদিন গান হাজত হয়। শেষের দিন অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে সারারাত্রি গান হয়। গানের শেষে হাজত হয়ে শেষ হয়। একজন পালাগায়কই গান করেন। এক-একদিন এক-একজন দেবদেবীকে নিয়ে পালাগান হয়। সেইদিন যদি কোনও ভক্তের মানত থাকে তবে তিনি এসে মানত চোকান। তবে কেউ কোনোও বিশেষ দেবদেবীর মানত করলে সেইদিন যদি তিনি আসতে না পারেন অন্য দিন এসে মানত চোকাতে পারেন, সেক্ষেত্রে পালাগায়ক সেইদিন সেই বিশেষ দেবদেবীকে নিয়েও গান করেন।

সাক্ষাৎকার সূত্রে জানা যায় পালাগায়কদের 'ভর' হয়। সাধারণত যে দেবদেবীর থানে তাঁরা গাইতে আসেন সেই দেবদেবীর 'ভর' হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাগায়ক সুধীন মণ্ডল (বয়স ৭৯) কুড়ি-পঁচিশ বছর দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহ প্রাঙ্গণে দরবার বিবির থানে গান করেছেন। একবার উনি গৃহে চামরটি ফেলে গাইতে এসেছিলেন। ফলে ওনার ভর হয়েছিল। উনি বেল গাছ উপড়িয়ে ফেলেন।

তারপর পড়ে গিয়ে ওনার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। সবাই মিলে ঠাকুরের কাছে অন্যায় স্বীকার করে ওনাকে ঠাণ্ডা করেন। আধ ঘন্টা সময় কাল ভর স্থায়ী হয়েছিল। সকলে মনে করেন দরবার বিবির প্রভাবে ঘটনাটি ঘটেছে।

বর্তমানে পালাগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। জনপ্রিয়তা হারানোর কারণ হিসেবে বলা যায় সামাজিকভাবে পালাগায়কদের মর্যাদা থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা অনেক পিছিয়ে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে গান, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো শিখলেও উত্তরসূরী আর পালাগান বিষয়ে তেমন আগ্রহী নন। অভিভাবক হিসেবে এনাদের ইচ্ছা সন্তান তাঁদের মতো পালাগান গেয়ে অভাব অনটনে না ভুগুক, ভালো পড়াশোনা করে চাকরি করুক। বর্তমানে তাই পালাগানের মতো এত জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হারিয়ে যাচ্ছে কেবলমাত্র নতুন লোকশিল্পীর অভাবে। বর্তমানে দেখা যায় লোকশিল্পীদের সন্তানেরা এখন অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, কেউবা চাকরিজীবী। অথচ আগে যে সমস্ত লোকশিল্পী ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলে স্বল্প শিক্ষিত, কেউবা নিরক্ষর। কেবল পালাগান গেয়ে সংসার চলে না। আর্থিক অনটন এনাদের নিত্য সঙ্গী। যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে দুর্ভোগের শেষ থাকে না।

পালাগায়কেরা গুরু শিষ্য পরম্পরায় গান করেন। একজন গুরুর দুশোর উপরেও শিষ্য থাকে। যে সমস্ত পালাগায়ক আগে সত্তর-আশিটা আসর পেতেন পরে তাঁদের আসরের সংখ্যা কমে চল্লিশ-পঞ্চাশটা হয়ে যায়। বর্তমানে সংখ্যাটি আরও কম। পালাগানের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। ভয় থেকে আসে ভক্তি, শ্বাপদশঙ্কুল বাংলাদেশে সাপের উপদ্রপ ছিল ব্যাপক, তাই দেবী মনসার ভক্তও ছিল প্রচুর। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ভালো রাস্তাঘাট তৈরি করায় সাপের উপদ্রব অনেক কমেছে। স্বাভাবিকভাবে ভক্ত সংখ্যাও কমেছে। আবার জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচতে মা বনবিবিকে পূজা করা হত। বর্তমানে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখি হচ্ছেন। ঘরের মেয়েরা যারাই এতদিন লোকদেবদেবী কেন্দ্রিক সংস্কারগুলি বেশি করে মানতেন তাঁদের বেশির ভাগই শহরে আসেন পরের বাড়িতে ঝিগিরি, রান্না করতে, কেউবা ব্যাগ তৈরির কাজ করতে। ফলে মানুষের রাতের পর রাত জেগে পালাগান শোনার সময় নেই। আরেকটি বিষয় আগে বিনোদনের বিষয় ছিল গোষ্ঠ, গাজন, পালাগান, যাত্রা, কীর্তন; বর্তমানে বেশিরভাগ বাড়িতে দূরদর্শন পৌঁছে গিয়েছে বা মোবাইল ফোন মানুষের হাতে চলে এসেছে। যার ফলে মানুষ তাদের সময় সুযোগ মতো সিরিয়াল দেখেই সময় কাটিয়ে দেন।

পালাগানের প্রধানত দুটি দিক। যেমন – (ক) লিখিতরূপ ও (খ)

পরিবেশনগত। পালাগান পরিবেশনের লিখিত দলিল হল পুঁথি। পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিবর্তনের সুযোগ পায় কিন্তু পুঁথি লিখিত টেক্সট হওয়ায় কাহিনি অপরিবর্তনীয় থাকে। যার ফলে তৎকালীন সমাজের কথা কৌতূহলী পাঠক জানতে পারেন। পুঁথির কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে পালাকারেরা গান রচনা করেন। পালাগান পরিবেশনের সময় পুঁথির কাহিনির বিশাল পরিধি দেখানো সম্ভব হয় না। পালাগায়কদের কিছু স্বাধীনতা থাকে, পুঁথি লেখকদের সেই স্বাধীনতা থাকে না। পালাগায়কেরা যখন আসরে গান পরিবেশন করেন তখন জনরুচির কথা মাথায় রাখেন। তাই তাঁরা সমকালের কোনও বিষয় নিয়ে মজার মজার কমিক করেন। সেখানে সমাজ, রাজনীতি, প্রেমের কথাও উঠে আসে।

একশো বছরের বেশি পুরনো লিখিত পুঁথিগুলি থেকে সেই সময়কার ইতিহাস আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'বাংলা পীরসাহিত্যের কথা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৪ঃ 'পীর-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি' অংশে বলেছেন ''ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নর-নারীরা সমাজ-চিত্র এই পীর-সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার সূত্রপাত হতে থাকে। পীর পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক। আধুনিক যুগে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য জীবনী সাহিত্য রচিত হওয়ার পর থেকে পীর-পাঁচালী কাব্য প্রকাশের বেগ কমতে থাকে।'' পুঁথিগুলি আজ বিলুপ্ত প্রায় হতে চলেছে তাই এগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে পালাগান পরিবেশনের অডিও বা ভিডিও সেভাবে করা হয়নি, বা বর্তমানে গবেষকরা অডিও বা ভিডিও করলেও সকল মানুষের কাছে তা এখনও পৌঁছুতে পারেনি। তাই পালাগানের কাহিনি ও ইতিহাস জানতে আমাদের লিখিত গ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা ঃ

১. ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* - গ্রন্থ থেকে গাজি, পীর, বিবি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাব্য, নাটকের গ্রন্থ তালিকা (পৃষ্ঠা - ৪৯৯) পাওয়া যায়।

২. 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা', ড. দেবব্রত নস্কর, পৃষ্ঠা - ৫৩৭।

৩. সুজিত কুমার মণ্ডল, *বনবিবির পালা* গ্রন্থে জানিয়েছেন — 'গীতি নাট্যের বেলায় আসর বন্দনা করেন কেবল নারী চরিত্রের অভিনেতা- অভিনেত্রীরা, পৃষ্ঠা - ২৩৭।

৪. 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা', ড. দেবব্রত নস্কর, *পালাগায়ক ও পালাকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়*, পৃষ্ঠা - ৫৪৫।

৫. সুজিতকুমার মণ্ডল, *বনবিবির পালা* গ্রন্থে বলেছেন "একানি পালা' একক গীতাভিনয় এর ধারা। মূল গায়েন আসরে দাঁড়িয়ে আখ্যান বর্ণনা করেন কথায় ও গানে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত পালার অধিকাংশই 'একানি পালা'। 'একানি' শব্দটিও পালাকাররা ব্যবহার করেন। এই পালাভিনয়ের প্রাণশক্তি মূল গায়েন। তিনিই সমগ্র আখ্যানটি কথায় ও গানে বর্ণনা করেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বাদ্যকর ও দোহার থাকেন।" পৃষ্ঠা - ৩৫।

৬. 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষে' দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত। পৃষ্ঠা - ১৬২।

৭. 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত। পৃষ্ঠা - ২২৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

আবদুর রহীম সাহেব, ১৩৯৩, *গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি*, কলকাতা, ওসমানিয়া লাইব্রেরী।

আচার্য, দেবেশ কুমার, ২০০৯, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আদি ও মধ্যযুগ), কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

দাস, গিরীন্দ্রনাথ, ১৯৭৬, *বাংলা পীরসাহিত্যের কথা — চব্বিশ পরগণা*, শেহিদ লাইব্রেরী।

নস্কর, দেবব্রত, ১৯৯৯, *চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ১৯৯০, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।* কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

মণ্ডল, সুজিত কুমার সম্পাদিত, ২০১০, *বনবিবির পালা*, কলকাতা, গাঙচিল।

সেন, সুকুমার, ১৯৯৩, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

সাক্ষাৎকার ঃ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরা গ্রাম নিবাসী দেবপ্রসাদ ঘোষ (নায়েক পার্টি)।
সুধীনকুমার মণ্ডল – পালাগায়ক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বেগমপুর।
গোষ্ঠ মণ্ডল – পালাগায়ক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, আটঘরা।
অনিল হাজরা – পালাগায়ক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বেগমপুর।